STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

সেপ্টেম্বর ২০১৬
নবপর্যায় ৪১
মূল্য ১০ টাকা

৭-দফা দাবি : অগ্রগতি কতদূর

॥ পর্যবেক্ষক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক মহাসমাবেশের ডাক দেয়। সারা দেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক সংখ্যালঘু জনতা এতে যোগ দেয়। অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এ মহাসমাবেশ থেকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয় ৭-দফা দাবিনামা, যাতে ঐক্য পরিষদ ছাড়াও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনরিটিজ(এইচআরসিবিএম), বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, শ্রীশ্রী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ আশ্রম ট্রাস্ট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ ও বাংলাদেশ পঞ্চায়েত ফোরামের নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেন।

বস্তুত ৪৭-র দেশভাগের পর সংখ্যালঘুদের এ জাতীয় মহাসমাবেশ এ-ই প্রথম, যা দেশ-বিদেশের নানান রাজনৈতিক ও সুধী মহলে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, বাসদ, জাসদ, ওয়াকার্স পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় সংলাপে অংশ নিয়ে এসব দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'সংখ্যালঘু জনজীবনের সমস্যা কেবল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা নয়, এ সমস্যা জাতীয় সমস্যা। এর সঠিক সমাধানে গোটা দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার এখনই সময়। অন্যথায় গণতন্ত্র, জাতীয় অগ্রগতি বিপর্যয়ের মুখে পড়তে বাধ্য।' জাতীয় সংলাপে রাজনৈতিক ঐকমত্যের পরপরই সারা দেশ থেকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ৭-দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

সংখ্যালঘু জনজীবনের সমস্যা কেবল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা নয়, এ সমস্যা জাতীয় সমস্যা। এর সঠিক সমাধানে গোটা দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার এখনই সময়। অন্যথায় গণতন্ত্র, জাতীয় অগ্রগতি বিপর্যয়ের মুখে পড়তে বাধ্য।

এ দাবিনামায় যা রয়েছে তা হলো- ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য

পৃষ্ঠা ২

মনের ক্ষত দূর করুন

অজয় দাশগুপ্ত

সমকাল পত্রিকায় ২৯ সেপ্টেম্বর একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল এভাবে– 'পোড়া মন্দির রঙিন হলেও দূর হয়নি মনের ক্ষত'। রামু ট্র্যাজেডির চার বছর উপলক্ষে প্রকাশিত এ বিশেষ প্রতিবেদনের সঙ্গে ছিল দুটি ছবি, যার একটিতে সেই ধ্বংসস্তূপ এবং অন্যটিতে নতুন করে গড়ে তোলা বৌদ্ধ মন্দির। নতুন করে নির্মিত মন্দিরটি বর্ণিল, আকর্ষণীয়। আধুনিকতার ছাপ আছে প্রতিটি ধাপের কাজে। আরেকটি ছবিতে রয়েছে ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই টিকে যাওয়া বৌদ্ধ মূর্তি। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর গুজব রটিয়ে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও টেকনাফে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ১০-১২টি মন্দির ও বিহার। লুটপাট ও ভাঙচুর চলে বৌদ্ধদের বাড়িঘরে। দুর্ভাগ্যজনক যে ঘন্টার পর ঘণ্টা উন্মত্ততা চললেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ছিল নীরব দর্শক। ঘটনার পর ১৮-২০টি মামলা হয়েছে। আসামী শত শত। কোনোটির চার্জশিটও হয়েছে। কিন্তু সাক্ষী মিলছে না। ফলে মামলাগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যাদের সাক্ষী হিসেবে পুলিশ নির্বাচন করেছিল, তাদের কেউ কেউ কথা বলছে আসামীর পক্ষে। কেন উল্টো সুর তাদের? কে বা কারা এর পেছনে?

ঘটনা ঘটেছিল প্রকাশ্যে। যদিও রাতে চলেছে এ তাণ্ডব, কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখায় স্পষ্ট দেখা গেছে অপরাধী মুখগুলো। এটাও আমাদের জানা যে, শত শত বছরের সভ্যতা-সাংস্কৃতিক নিদর্শন ধ্বংসের জন্য উস্কানি দেওয়া হয়েছে দুদিন আগে থেকেই। কারা এ সব করেছে তা তো প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অজানা নয়। মনের ক্ষত যে কেন দূর হয় না, তা বুঝতে তাই সমস্যা হয় না।

গুজব রটিয়ে গত কয়েক বছরে চট্টগ্রামের হাটহাজারি, বরিশালের সদর উপজেলা, পাবনার সাঁথিয়া, দিনাজপুর, সাতক্ষীরাসহ আরও কয়েকটি স্থানে হিন্দুদের ওপর সংঘবদ্ধ হামলা চলে। এ ঘটনার বেশিরভাগ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত করা হয়েছে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগে ও পরে এমন অপরাধ আমরা ঘটতে দেখেছি। ২০১৪ সালে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। তাতে প্রধানত মাত্র কয়েক মাসে যেসব সংখ্যালঘুদের মন্দির, গীর্জা, মঠ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দেশের সব জেলাতেই ঘটেছিল সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা।

কিন্তু আরও কষ্টের কথা যে বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে...। প্রকাশ্যে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রেও যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাক্ষী সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে বড় ধরনের ক্ষত তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতা লিখেছিলেন বরিশালের গৈলা গ্রামের তারক সেনের মৃত্যুর প্রতিবাদে। স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রণী তরুণ তারক সেনকে হুগলি জেলে গুলি করে হত্যা করেছিল ব্রিটিশ পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজিত জনসমাবেশে সভাপতির ভাষণে কবিগুরু এ কবিতায় 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ...'-এর তীব্র নিন্দা করেছিলেন। আমরা তো চাই না কোনো অপরাধই প্রতিকারহীন থাকুক। আর এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তার হাতে তো ক্ষমতার ঘাটতি নেই। অপরাধী যত দুর্ধর্ষ হোক, রাষ্ট্রের কাছে

পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশে পুজো বেড়েছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সারাদেশে এবছর দুর্গা পুজোর সংখ্যা বেড়েছে। এবার পুজোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৩৯৫। শারদোৎসবের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এ তথ্য জানিয়েছে। এছাড়া শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আবারো তিন দিনের সরকারি ছুটিরও দাবি জানানো হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব সিদ্ধান্ত ও দাবি তুলে ধরা হয়। *(বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)*

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শুভ মহালয়ার দিনে শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট তাপস কুমার পাল। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, সহ-সভাপতি মঞ্জু ধর, মিলন কান্তি দত্ত, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডিএন চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শ্যামল কুমার রায়, মনীন্দ্র কুমার নাথ ও নির্মল কুমার চ্যাটার্জী।

মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, আগামি ১১ অক্টোবর বিজয়া দশমী। এর পরের দিন মুসলিম সম্প্রদায়ের আশুরা। তাই দুই উৎসবের পবিত্রতা রক্ষায় বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার আগে বিজয়া শোভা যাত্রা এবং রাত ৯টার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিষয়টি সারাদেশের পূজা উদযাপন পরিষদের নেতাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশের শাশ্বত রূপ এটাই

॥ ভাষ্যকার ॥

বাংলাদেশের আবহমানকালের ঐতিহ্যেরই ছবি। ওঁরা বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা-কর্মী। কোন মানববন্ধন কিংবা বিক্ষোভ সমাবেশ করার জন্যে তাঁরা খবর হননি। বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উৎসারিত ঐক্য ও সহমর্মিতার যে চেতনা আবহমান কাল ধরে আমাদের পথ দেখাচ্ছে বস্তুত তারই ছবি এটি। ঈদুল আজহায় হবিগঞ্জে শাহী মসজিদে নামাজের সময় জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় স্বেচ্ছাসেবকরা পাহাড়া দেন, যাদের মধ্যে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এই নেতা-কর্মীরা ছিলেন। এর আগে ঈদুল আজহায় শ্রীমঙ্গলে ঈদের জামায়াতে পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিলেন পূজা উদযাপন পরিষদ ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা-কর্মীরা। মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারাও নামাজের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্তমান জঙ্গিবাদী হামলার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের ঘটনা ব্যতিঘর হিসেবে কাজ করে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। ধর্মকে হাতিয়ার করে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও সমরতন্ত্র কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এর মধ্যে বাঙালির আত্মদর্শন ঘটে পূর্ব পাকিস্তানে, যার কারণে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ, স্বাধিকারের চেতনার বিকাশ এবং গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক আদালতে বিচার বন্ধ করে কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনার মতো ঘটনা ঘটে। পালাবদল হয় সামরিক শাসকদের। ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তানি শাসকরা। নির্বাচন ঘোষিত হয়, আর সেই নির্বাচনে বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রায় ঘোষণা করে। কপালে ভাজ পড়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের। রায় অস্বীকার করা হয়, আলোচনার নামে কালক্ষেপন করেন ইয়াহিয়া খান। অন্যদিকে হামলার প্রস্তুতি চলে। ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি জাতির ওপর। শুরু হয়ে যায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। তার আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৭ মার্চ অস্ত্র হাতে নিয়ে শত্রুসেনা মোকাবেলার জন্যে তিনি প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশ দেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে গঠিত হয় বিপবী সরকার, আর এই সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে যায়। এই ইতিহাস বারবার তুলে ধরা প্রয়োজন এ

পৃষ্ঠা ৩

৭-দফা দাবি : অগ্রগতি কতদূর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা ধর্মান্ধতা সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ।

এরই মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ ৭ দফা দাবি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে খানিকটা পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সরকারি দল ও জোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে না হলেও পূর্বেকার চেয়ে অধিকতর মনোযোগী হয়েছে। বিশেষ করে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ভূমিকা দৃশ্যমান হয়েছে। দলের ভেতর থেকে এক বিশেষ মহল সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়ার এবং তাদের জয়লাভের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবে বিরোধীতা করলেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থীদের বেশীর ভাগই উতরে গেছেন।

বিরোধী দল বিএনপি ও জাতীয় পার্টির জাতীয় সম্মেলন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যকরী কমিটি ঘোষিত হয়েছে। আগে যেখানে উপদেষ্টা পরিষদ, স্থায়ী কমিটি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সব মিলিয়ে তিন-চারজনের বেশি সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় নি, এবারে সে সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। কেউ কেউ সম্পাদকের পদও পেয়েছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সম্মেলন আগামি অক্টোবর মাসে। দেশবাসী আশা করছে, প্রধানমন্ত্রী, যিনি সরকারি দলের প্রধান, সংখ্যালঘুদের যথাযথ অংশীদারিত্বে, প্রতিনিধিত্বে তিনি এবার দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ৭-দাবির প্রথম দফা ১(গ)-তে উল্লিখিত আছে, 'ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষে দেশের সব রাজনৈতিক দলের তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি সাংগঠনিক কমিটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অন্যূন ২০% হারে সংখ্যালঘু-আদিবাসীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।' এ দাবি পূরণের ক্ষেত্রে খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।

জাতীয় সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষে যুক্ত নির্বাচনের (সার্বজনীন ভোটের) ভিত্তিতে ২০% হারে (৭০-র জনসংখ্যা অনুসারে) ৬০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থায়ও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৭-দফা দাবিনামার ১(ক) দফায় তা উল্লেখিত আছে। ইতিমধ্যে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। বর্তমান সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ অতি সম্প্রতি তার নিজ দলের জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে এ মর্মে অংগীকার করেছেন যে, তিনি তার দলের সামনের নির্বাচনী ইজতেহারে সংসদে হিন্দুদের জন্যে ৩০(ত্রিশ)টি আসন সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৭-দফা দাবিনামার ৪(ক) দফায় 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে অনতিবিলম্বে তা কার্যাকরের' দাবি উল্লিখিত আছে। ২০০৯ সালে পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংসদে পাস হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ বিভিন্ন পাহাড়ী সংগঠন পার্বত্য শান্তিচুক্তির সঙ্গে আইনটির ২৩টি ধারা বিরোধপূর্ণ উলেখ করে তা সংশোধনের দাবি জানায়। পরবর্তীতে তা পর্যালোচনা করে ১৪টি ধারা পরিবর্তনে সরকার ও আঞ্চলিক পরিষদ সম্মত হয়। গত ১ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন (সংশোধন) ২০১৬ অনুমোদন দেয় মন্ত্রীসভা। মন্ত্রীসভায় এ আইনের অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে এবং অর্ডিন্যান্স আকারে তা জারি হওয়ার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ লক্ষ করার মতো। গত ৮ আগস্ট তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি সার্কিট হাউজে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশনের প্রথম সভায় এর ন'জন সদস্যের প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), চাকমা সার্কেল প্রধান রাজা দেবাশীষ রায়, সাবেক পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর গওহর রিজভীও এতে উপস্থিত ছিলেন। সরকারের এহেন ইতিবাচক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে পার্বত্যবাসীর দীর্ঘকালের শংকা ও উদ্বেগের অবসান ঘটিয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের কার্যকর প্রয়োগে পার্বত্য এলাকায় ভূমি সমস্যার সার্বিক সমাধান সারা দেশের মানুষ সুগভীর আগ্রহে প্রত্যাশা করছে।

'সংখ্যালঘু সুরক্ষাজনিত আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত বিচার আইন ও সন্ত্রাস দমন আইনে শাস্তির বিধান বাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে শাস্তি নিশ্চিতের প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ সুনিশ্চিতকরণের' দাবি রয়েছে ৭ দফা দাবিনামার ৬(খ) দফায়। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জংগীদের বিরুদ্ধে মামলার বিচারের জন্যে চলতি বছরের অক্টোবর মাসে যে সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে তাতে হরতাল-অবরোধে নাশকতার অভিযোগের মামলার পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলার বিচার কাজ চলবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী দ্রুত এসব মামলা নিস্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অভিযোগপত্র দিতে বলেছেন। সংখ্যালঘু জনমনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকার কারণে যে হতাশা ও ক্ষোভ ছিল সরকারের এ উদ্যোগ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হলে তা প্রশমনে এবং আস্থার ভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশে পুজো বেড়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিন দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা, ঈদের মত শারদীয় দুর্গোৎসবেও বঙ্গভবন, গণভবন, নগর ভবন, জেলা পর্যায়ে সরকারি ভবন ও সড়কে আলোকসজ্জা, সব কারাগারে পুজোর দিনগুলোতে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন, ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাতিল করে হিন্দু ফাউন্ডেশন গঠন এবং পুজো মণ্ডপগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। নির্বিঘ্নে-নিরাপদে পুজো উদযাপনে ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানানো হয়। এডভোকেট তাপস কুমার পাল বলেন, পাঁচ দিনের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসবে তিন দিনের ছুটি অত্যাবশ্যক, এটা শুধু দাবি নয়। মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, গত বছরের চেয়ে ৩২৫টি বেড়ে এবছর পূজার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৩৯৫টি। ঢাকা মহানগরীতে ২২৯টি মণ্ডপে পূজা হবে। তবে পূজারীর সংখ্যা কমায় উদ্বেগ জানানো হয়। পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়, ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৪ শতাংশে। ১৯৫১ সালে দেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমে ২২ শতাংশ ও ১৯৭১ সালে ১৪ শতাংশ ছিল। হিন্দুদের এই ধস রুখে দেশের বৈচিত্র্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে। পূজা মণ্ডপে বিদ্যুতের বাণিজ্যিক চার্জ নির্ধারণ না করার দাবি জানানো হয়। নেতারা বলেন, এবছর শুরুতে কিছু জায়গায় প্রতিমা ভাঙচুরের পর প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। সিলেটে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় একজনকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়েছে। কয়েকজন পুরোহিত, সেবায়েত হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ থাকলেও পুজো উপলক্ষে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন নেতারা। তবে সারাদেশের পুজো মণ্ডপগুলোকে সতর্ক থাকতে ও নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক রাখতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৩৩-২৯২৩৯৬ যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষদ বার্তার কপি নিয়মিত পাওয়ার ব্যাপারে ঐক্য পরিষদের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষের সাথে ০১৭১২-৭৬০৬৮৪ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

পরিষদ বার্তার ই-মেইল সংবাদ পাঠানো প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা parishadbarta@gmail.com-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবর বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

মনের ক্ষত দূর করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা অসহায় হতে বাধ্য।

গত এক বছরে দেশের নানা স্থানে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা ঘটেছে। যারা এর পেছনে তারাই কিন্তু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত। আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার জন্য এ অপশক্তি এখন নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। তারা সেই পাকিস্তান আমলের মতো 'ইসলাম বিপন্ন' স্লোগান তুলছে। কিন্তু শোলাকিয়ায় পবিত্র ঈদের জামাতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে কীভাবে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করা যায়? তাদের কারণেই এখন ঈদের জামায়াতগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে অবস্থানরত কয়েকজন বিদেশীর ওপরেও সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি নামক এক রেস্তোরাঁয় নৃশংস হামলা চালিয়ে ২০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৭ জনই ইতালি ও জাপানের নাগরিক, যাদের বেশিরভাগ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও ঢাকার রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন নারীও রয়েছেন। সন্ত্রাসীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন পুরোহিতকে হত্যা করে। 'নাস্তিক' আখ্যায়িত করে বগারদের ওপর হামলার ঘটনা আমরা দেখেছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আয়োজন ভন্ডুল করার অপচেষ্টার সময়। এখন দেখছি নতুনরূপে সন্ত্রাস। এটা স্বস্তির খবর যে পুলিশ-র‍্যাব দ্রুতই এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীদের দমন করতে পেরেছে। ঢাকার কমলাপুর ও আজিমপুরে এবং নারায়ণগঞ্জে তারা সফল অভিযান চালিয়ে ধর্মের নামে সংগঠিত হওয়া দুর্বৃত্তদের দমন করতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বার বার বলেছেন, সন্ত্রাসের প্রশ্নে সরকারের নীতি হচ্ছে জিরো টলারেন্স। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এমনটিই দেশবাসী দেখতে চায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনার জন্য জড়ো হওয়া সন্ত্রাসীদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আগেভাগেই পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে আমাদের পুলিশ-র‍্যাবের ওপর ভরসা রাখা যায়। তাদের সে সক্ষমতা রয়েছে। একইভাবে আমাদের প্রত্যাশা, সমাজের যেখানেই মানুষের অধিকার বিপন্ন হোক সেখানেই তারা দাঁড়াতে দৃঢ়সংকল্পে। যে কোনো দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর পাশে বলিষ্ঠ অবস্থান নেয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। বাংলাদেশেও এটা সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। এতে কোনোভাবেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টির মাধ্যমে। পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন করা হয় তাদের পিতৃপুরুষের ভিটামাটি থেকে। এ কারণেই দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আরও সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে– ১৯৪৭ সালে তারা ছিল মোট জনসংখ্যা ৩০ শতাংশের মতো, এখন তা নেমে এসেছে ৯ শতাংশে। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণে নিপীড়নকে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা দেয় না। কিন্তু সমাজের ভেতরে তো দুর্বৃত্ত রয়ে গেছে। তাদের দমন করতে না পরলে সংখ্যালঘুরা আরও প্রান্তিক হয়ে পড়বে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কিন্তু উন্নয়নও বিঘ্নিত হয়। কে তা কামনা করে?

কুমিল্লার নতুন জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা ঐক্য পরিষদ ও পূজা পরিষদের নেতৃবৃন্দের

॥ কুমিল্লা প্রতিনিধি ॥

গত ২৪ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কুমিল্লার নতুন জেলা প্রশাসক মোঃ জাহাংগীর আলমকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কুমিল্লা জেলা ও মহানগর শাখার নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন– বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কুমিল্লা জেলা শাখার সভাপতি চন্দন কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ তাপস কুমার বকসী, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাপস চন্দ্র সরকার, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কুমিল্লা জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী (রাজু) ও সাংগঠনিক সম্পাদক কমল চন্দ খোকন, ঐক্য পরিষদ কুমিল্লা মহানগর শাখার সদস্য সচিব নির্মল ঘোষ, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মধুসূদন রায় ও বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ কুমিল্লা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন রায়।

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশের শাশ্বত রূপ এটাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কারণে যে, সেইদিনের কথা অনেকে ভুলে যান। তারই অনিবার্য পরিণতি আজকের ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ।

এক নদী রক্ত, তিরিশ লাখ মানুষের আত্মদান এবং লাখ লাখ নারীর সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত, পরমবন্ধুর মতো। যে মৈত্রী ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই মৈত্রী। ভারতীয় সেনাদের রক্ত মিশে গিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সঙ্গে। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করেছিল ৯০ হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি সেনা জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে। ঐদিন অপরাহ্নে এক অভূতপূর্ব বিজয়ের ছবি বাংলাদেশ ও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করে। গ্রন্থিত হয় নতুন বিজয়গাঁথা। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের এই মৈত্রী শুধু ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বন্ধনের নয়। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই মৈত্রী ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের। নীতির। বিশ্বে সেদিন এই বক্তব্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে যে নীতিমালা আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল তা হচ্ছে- গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। পরবর্তীকালে এই চার নীতিই সংবিধানের মূল নীতি হিসেবে স্থান পায়। দেশ এগিয়ে চলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে বাংলাদেশ। ঠিক এই সময়েই আঘাত হানে পরাজিত শক্তি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। দখলকার শক্তি দেশকে পেছনের দিকে পাকিস্তানের পথে ঘুরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা নির্বাসিত হয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ নতুন সংজ্ঞা লাভ করে, সমাজতন্ত্র বাস্তবতা হারায়। গণতন্ত্র পিষ্ট হয় সমরতন্ত্রের বুটের তলায়। ধর্ম আবার রাজনীতির হাতিয়ার হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টই কার্যত রোপিত হয়েছিল ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের বীজ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসনে এই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়। ক্ষমতায় যারা গেছেন তারা ধর্মান্ধতার সঙ্গে বারবার আপস করার চেষ্টা করেছেন। ক্ষমতায় থাকার জন্যে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে। বঙ্গবন্ধু ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকেই শুধু ছাঁটাই করেননি, এই নিষেধাজ্ঞাও বাতিল করে দেন। যেমন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তিনি বন্ধ করেছিলেন। ধীরে ধীরে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি জোরদার হয়, জিয়াউর রহমান একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে পুনর্বাসিতও করেন। সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে একাত্তরের সেই ঘাতকদের ক্ষমতাসীনও করেছেন। একাত্তরের পতাকা তুলে দিয়েছেন তাদের হাতে। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম করেছেন, যা আজও সংবিধানে আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, রাষ্ট্রধর্মও আছে। এরশাদ আমাদের শিখিয়েছেন, রাষ্ট্রেরও ধর্ম থাকে। আমাদের রাজনীতিকরাও শিখেছেন, রাষ্ট্রের ধর্ম থাকে।

তবে সৌভাগ্যের কথা, আজ বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, এভাবেই ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদ বিকশিত হয়েছে। তবে অনেক মূল্য দিয়ে। এর মধ্যে রাজধানীর বুকে সবচেয়ে নিরাপদ এলাকায় বিদেশিদের হত্যা করা হয়েছে, বিদেশি রেস্তোরায় হামলা করে জঙ্গিরা। প্রাণ গেছে বিদেশিসহ ২২ জনের। শোলাকিয়ায় ঈদের জামায়াতে হামলা হয়েছে। মসজিদে হামলা হয়েছে। জঙ্গিবাদ মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। সরকার কঠোর হাতে জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করছে। এ প্রশ্নে একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ঐকমত্য ধরে রাখতে হবে। আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। জঙ্গিবাদ আজ আমাদের এক কাতারে নিয়ে এসেছে, যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধে গড়ে উঠেছিল। আজ যে ঐক্য আমাদের পথ দেখাচ্ছে, তাকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ বলতেই হবে। দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে আর কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না।

ছবি আমাদের সামনে যে চেতনা তুলে ধরছে তা এগিয়ে নিতেই হবে। নইলে বাংলাদেশ বাঁচবে না। আর কোন ঘাতকের হাতে যেন বাংলাদেশের পতাকা না ওঠে। বাংলাদেশের তারুণ্য রুখে দাঁড়াচ্ছে, এটাই আশার কথা।

আজ তরুণরা বিভ্রান্ত বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু এটা ভাবা দরকার, কেন তারা বিভ্রান্ত? বাংলাদেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছে, কিভাবে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার লড়াই হয়েছে, এ ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের সামনে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়নি। বরং তারা দেখছে, রাজনীতিকরা বলছেন একরকম, করছেন অন্যরকম। আজ ভোগের রাজনীতি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে মুছে ফেলতে চাইছে। তাদের সামনে আদর্শ কি? আমরা কি ত্যাগের রাজনীতি তাদের সামনে রাখতে পেরেছি? জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, গোটা দেশ স্তব্ধ হয়ে গেল। অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি হানাদারদের মোকাবেলা করার নির্দেশ দিলেন, লাখ লাখ তরুণ কিসের আহ্বানে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়লো? তাদের সামনে ছিল দেশ, বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে জাতির জনককে হত্যার পর তারা দেখলো, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাল্টে যাচ্ছে। মূল্যবোধ ও চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে।

পৃষ্ঠা ৭

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণাপত্রে এনেছিল- পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের সমর্থন তাতে মিললেও সোভিয়েত বকের সমর্থন তখনও মেলেনি। প্রতিনিধিদলের অন্যতম নেতা ডাঃ সারোয়ার আলী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন তারা মস্কোতে সোভিয়েত নেতাদের সাথে কথা বলে তেমন ভাল সাড়া পাননি। সে সময়ে মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডি পি ধর প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই মর্মে যে, ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর হতে চলেছে- যেটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠে একাত্তরে। এই চুক্তির পরোক্ষ ফল হোল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দল ও গ্রুপগুলোর একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের তাগিদ। এই ব্যাপারে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের উপর সোভিয়েত এবং ভারত ক্রমাগত চাপ বাড়াতে শুরু করে। বর্ষিয়ান নেতা জয় প্রকাশ নারায়ন ও ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ সহকারী ডিপি ধরের ক্রমাগত চেষ্টা, ভারত ও সোভিয়েত ক্রমাগত চাপে বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৮ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। আওয়ামী লীগের পূর্ণ সমর্থনের অভাবে উক্ত কমিটি প্রায় অকার্যকর থাকে। মৌলানা ভাসানী কমিটির কাজ কর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, মোজাফফর আহমেদ ও নিজের হতাশার কথা গোপন রাখেননি।

যদিও ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পর মস্কো বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জোরদার করে, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ব্রেজনেভ স্বীকার করেন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপাদান রয়েছে।

লক্ষণীয় জুন মাসে "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি" নামে ভাসানীপন্থী দল উপদল একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করে 'সর্বদলীয় জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট' গঠনের দাবি নিয়ে। অপরদিকে তাজউদ্দিন আহমদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় এ লক্ষে তাজউদ্দিনের প্রতিপক্ষ শেখ ফজলুল হক মনির মুজিববাদী গ্রুপের ৪০ জন পার্লামেন্ট সদস্য সমবায়ে 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব প্রভৃতি লক্ষ্য করলে নিদ্বিধায় বলা যায় জন্মলগ্নে বাংলাদেশ একটি জটিল সংকটে হাবুডুবু খেতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সরকার গঠিত হলে আজকের বাংলাদেশের অধিকাংশ সমস্যা সংকটের উদ্ভব ঘটতো না একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

দিনাজপুরে দ্বাদশ শতকের বিষ্ণু মন্দির আবিষ্কার

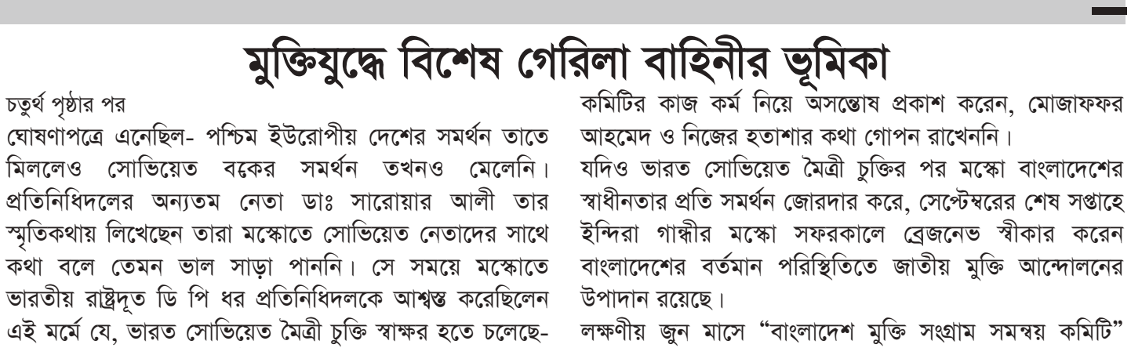

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সুন্দর একটি মন্দির রয়েছে তা তারা কোনভাবেই অনুমান করতে পারে নি। তিনি জানান, অনেকেই এখানে ছাগল-গরু বাধতো। এলাকার স্বপন চন্দ্র রায় জানান, যেহেতু এটি ভগবান বিষ্ণুর মন্দির হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে তাই এটিকে এভাবেই রেখে দেয়ার দাবি এলাকাবাসীর, যাতে করে তারা এখানে পূজা অর্চনা করতে পারেন। একই দাবি জানিয়ে এলাকার ভবেষ চন্দ্র জানান, যদি এটি এভাবে রেখে দেয়া যায় তাহলে পূর্বের মন্দির কি রকমের ছিল তা জানতে তাদের এলাকায় অনেকেই আসবেন সুন্দর এই মন্দিরটি দেখতে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সীমা হক জানান, আবিষ্কৃত মন্দিরটির প্রবেশদ্বার পূর্ব দিকে। প্রাচীন এই মন্দিরের নকশা ও স্থাপত্যশৈলী দেখে সহজেই অনুমান করা যায় এক সময়ে এই অঞ্চল উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তণে এই অঞ্চল অবহেলিত হয়ে পড়ে।

খনন দলের প্রধান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেন জানান, স্থাপনাটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য আদিমধ্যযুগ বা খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের পূর্বভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর সামঞ্জস্য রয়েছে। কিছু আলামতের ভিত্তিতে তারা নিশ্চিত হয়েছেন এটি একাদশ বা দ্বাদশ শতকের নবরথ বিশিষ্ট একটি বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরটি দু'টি অংশে বিভক্ত। পশ্চিম দিকে ১২/১২ মিটার নিরেট পাটফর্মের ছোট কক্ষ রয়েছে। যেখানে প্রতিমার উপাসনা হতো। মন্দিরের বর্হিগতের অভিক্ষেপের সংখ্যা ৯টি। তাই এটিকে নবরথ মন্দির বলা হচ্ছে। তিনি জানান, এটি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত প্রথম নবরথ মন্দির। এর আগে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে একটি পঞ্চরথ মন্দির আবিস্কৃত হয়েছিল।

অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেন জানান, মন্দিরটির স্থাপনারীতি ও গঠনশৈলী নিয়ে ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষজ্ঞ দীপক রঞ্জন দাসের সাথে আলাপ হলে তিনি জানিয়েছেন মন্দিরটির উপরিকাঠামো পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। পাশাপাশি খনন কাজের শেষ দিকে ঢিবির পূর্বাংশ থেকে একটি দুস্প্রাপ্য প্রতিমার ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। প্রতিমাটি সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার প্রখ্যাত প্রাচীন শিল্পকলার ইতিহাসবিদ ক্লদিন বুদজে পিক্রো সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রতিমাটিকে বিষ্ণুর নারী অবতার মোহিনী হিসেবে সনাক্ত করেছেন। ক্লদিন জানিয়েছেন, প্রতিমাটি ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশে এই প্রথম প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণুর নারী অবতার মোহিনীর মূর্তি। নবরথ বিষ্ণু মন্দির ও দুস্প্রাপ্য মোহিনীর প্রতিমা পাওয়ায় এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন ভাবনা মোড় নিয়েছে।

তিনি জানান, খনন কাজ করতে গেছে তাদের কোন সমস্যা হয়নি। বরং এলাকাবাসীর সাথে এক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এখানে যেসব নির্দশন পাওয়া গেছে তা তাদের নিকটেই আছে। গবেষণা কার্যক্রম চালানোর জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তি মোতাবেক তারা এইসব নিদর্শন এক বছর পর্যন্ত গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন। পরে সেগুলো প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে জমা দিতে হবে। অধ্যাপক সেন জানান, নিয়ম অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব খননের পর ছবি তোলা ও ড্রয়িং কাজ নথিভুক্ত করার পর সংরক্ষণের জন্য স্থাপত্য কাঠামোটি পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তাই এই স্থাপনাটিও কয়েকদিনের মধ্যেই মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে। স্থানীয়দের দাবি রয়েছে এটি যেন উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, কিন্তু সেটি করতে হলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুমোদন ও সংরক্ষন করা লাগবে। সংরক্ষণ না করেই এভাবে রেখে দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে এটি নষ্ট হয়ে যাবে। বিষয়টি এলাকার লোকজনকে বোঝানো হয়েছে। তবে এরই মধ্যে প্রায় ৬শ' গ্রামবাসীর স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে স্থানটি সংরক্ষণ ও উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য। স্বাক্ষরসহ আবেদন স্থানীয় সংসদ সদস্য, ইউএনও, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সেখান থেকে সংরক্ষণের নির্দেশ আসলেই সংরক্ষণের পর তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া সম্ভব হবে।

তিনি জানান, এসব খনন কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় করে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই দিনাজপুরের বিরল উপজেলার একটি স্থানে খনন কার্যক্রম শুরু করা হবে। তিনি আশাবাদী যেভাবে সরকারি সহযোগিতা তিনি পান সেইভাবেই সহযোগিতা পেয়ে থাকবেন, আর এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য স্বাক্ষী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদ জানা সম্ভব হবে।

বি চি ন্তা

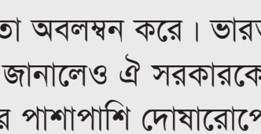

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

শরণার্থী স্রোত

পাক বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মুখে সারা দেশের মানুষের একটি অব্যাহত কাফেলা দিনের পর দিন সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার উপর অবর্ণনীয় চাপ সৃষ্টি করে, চাপ সৃষ্টি হয় উক্ত রাজ্যসমূহের সম্পদের উপরও। মে মাসের মধ্যভাগে এই শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ লক্ষের মত, যা জুন- জুলাইয়ে কোটির কোঠা ছাড়িয়ে যায়।

দেশের মাটি ছেড়ে অজানা অনিশ্চিত ভিন্নদেশের মাটিতে আশ্রয় গ্রহনেচ্ছু এই মানবস্রোত জনপথ গ্রামীণ পথ হাট বাজার গঞ্জ বন্দর অতিক্রমনকালে গ্রামের নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা মমতা খাদ্য ও পানীয় দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আপ্যায়ন ছিল নজীরবিহীন এক আবেগাপ্লুত দেশান্তরের অনন্য ঘটনা। যদিও পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে প্রাণ ও সর্বস্ব হারিয়েছেন অনেক হতভাগ্য দেশত্যাগে-উদ্যত নরনারী শিশু।

ভারত ও মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা :

প্রথম অবস্থায় ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে। ভারত মুজিবনগর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠায় নানা ভাবে সমর্থন জানালেও ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি বেশ কিছু দিন।

ভারতের উপরোক্ত অবস্থানের পাশাপাশি দোষারোপের রাজনীতি শুরু করে পাকিস্তান। তাদের অভিযোগ ভারত পাকিস্তানে অন্যায়ভাবে নাক গলাচ্ছে এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছে। তারা ভারতে আশ্রয়-গ্রহণকারী শরণার্থীদের 'বিদ্রোহী' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতিকারী' আখ্যা দেন যারা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত। তারা আরও অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার ও তাদের বিরোধী শক্তিকে ভারত সমর্থন দিচ্ছে। অস্থায়ী সরকার (প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা) ছিল সেদিনকার গভীর তাৎপর্যময় এক ঘটনা। তাজউদ্দিন আহমেদের দৃঢ় মনোবল, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক নীতি-নিষ্ঠ অবস্থান ভারত সরকারের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়। ১০ এপ্রিলে ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, আর ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে, মজবুত করে মুক্তি সংগ্রামের আইনগত ভিত্তি। এর পরে শুরু হয় বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ- প্রচেষ্টা সংগঠিত, সমন্বিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এক মুক্তিযুদ্ধের রূপ প্রদান করার কাজ।

সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রকে ১১ সেক্টরে বিভক্ত, সেক্টর কমান্ডার ও সাব সেক্টর নিয়োগ, প্রধান সেনাপতির নিযুক্তি উলেখযোগ্য ঘটনা। এই পথ ধরে পরবর্তীতে জেনারেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক, মেজর কে এম শফিউলাহ, মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ মোশারফের যথাক্রমে এস ফোর্স, জেড ফোর্স ও কে ফোর্স গঠিত হয়। প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্ব নিয়ে সেক্টর কমান্ডারদের কারো কারো ভিন্নমত ছিল। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেনাবাহিনী কাজ করে এবং পরবর্তীতে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের কাজও শুরু হয়।

প্রথম অবস্থায় ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে। ভারত মুজিবনগর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠায় নানা ভাবে সমর্থন জানালেও ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি বেশ কিছু দিন। ভারতের উপরোক্ত অবস্থানের পাশাপাশি দোষারোপের রাজনীতি শুরু করে পাকিস্তান। তাদের অভিযোগ ভারত পাকিস্তানে অন্যায়ভাবে নাক গলাচ্ছে এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছে। তারা ভারতে আশ্রয়-গ্রহণকারী শরণার্থীদের 'বিদ্রোহী' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতিকারী' আখ্যা দেন যারা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত। তারা আরও অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার ও তাদের বিরোধী শক্তিকে ভারত সমর্থন দিচ্ছে। অস্থায়ী সরকার (প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা) ছিল সেদিনকার গভীর তাৎপর্যময় এক ঘটনা। তাজউদ্দিন আহমেদের দৃঢ় মনোবল, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক নীতি-নিষ্ঠ অবস্থান ভারত সরকারের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়। ১০ এপ্রিলে ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, আর ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে, মজবুত করে মুক্তি সংগ্রামের আইনগত ভিত্তি। এর পরে শুরু হয় বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ- প্রচেষ্টা সংগঠিত, সমন্বিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এক মুক্তিযুদ্ধের রূপ প্রদান করার কাজ। সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রকে ১১ সেক্টরে বিভক্ত, সেক্টর কমান্ডার ও সাব সেক্টর নিয়োগ, প্রধান সেনাপতির নিযুক্তি উলেখযোগ্য ঘটনা। এই পথ ধরে পরবর্তীতে জেনারেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক, মেজর কে এম শফিউলাহ, মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ মোশারফের যথাক্রমে এস ফোর্স, জেড ফোর্স ও কে ফোর্স গঠিত হয়। প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্ব নিয়ে সেক্টর কমান্ডারদের কারো কারো ভিন্নমত ছিল। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেনাবাহিনী কাজ করে এবং পরবর্তীতে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের কাজও শুরু হয়।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশ সরকার বিনা বাধায় কার্যক্রম চালাতে পারেনি। জনপ্রতিনিধিদের একাংশ তাজউদ্দিনের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন বেশ কয়েকবার। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্বের বাইরে মুজিব বাহিনী নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী ভারত সরকারের সাহায্য- সহায়তায় গড়ে ওঠে।

অপর এক ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরে বিরোধ বিভক্তি দেখা দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসন অর্জনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুশতাক আহমদের ষড়যন্ত্রের রহস্য উদঘাটন। ফলে মুজিবনগর সরকার থেকে মোশতাককে অব্যাহতি, জাতিসংঘের প্রতিনিধি দল থেকে তার নাম বাতিল এবং নতুন পররাষ্ট্র সচিবের নিযুক্তিদান পাশাপাশি আগষ্ট মাসের প্রথমে ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের বক্তব্যকে বাংলাদেশ সরকার তার ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে আখ্যা দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর দিল্লী, কোলকাতা, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ষ্টকহোম, প্যারিস, হংকং ও টোকিওতে বাঙালি কূটনীতিকেরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ঘটনা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। কূটনৈতিক এই সাফল্য ধরে কলকাতা, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন কার্যক্রম শুরু করে। লন্ডন মিশন প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বহির্জগতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্তি লাভ করেন। উপরোক্ত দেশের বাংলাদেশী কূটনীতিকরা বিশ্বজনমতসহ প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৯ আগস্ট সোভিয়েত ভারত ২৫ বৎসর ব্যাপী শান্তি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের চাপে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ সরকারের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়- আওয়ামী লীগ জনপ্রতিনিধিদের বৃহদাংশের বিরোধীতা সত্বেও। এতে আওয়ামী লীগের তাজউদ্দিন, মোশতাক, ভাসানী ন্যাপের মাওলানা ভাসানী, মোজাফফর ন্যাপের মোজাফফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংহ, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর প্রমুখদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।

মনে রাখা দরকার বাঙালীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক দল সমূহের ঐক্য কার্যত: গড়ে ওঠেনি। যদিও ৬ দফা ও ১১ দফার জাতীয় ঐক্য জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধতা ছিল এবং সকল রকমের নরনারী অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয়েছিল কার্যকর জনযুদ্ধে।

মুক্তিযুদ্ধে প্রথম দিক থেকে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের বাইরে কাউকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হচ্ছিল না যদিও পরবর্তীতে কৃষক শ্রমিক নিম্নবিত্ত বিত্তহীন মানুষের সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপকভাবে অংশ নিতে এলে তাদের বাধা দিতে পারেনি উক্ত সংকীর্ণমনা আওয়ামী নেতৃত্ব। আওয়ামী লীগের বাইরে প্রগতিশীল সংগঠনের সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদানে মেজর খালেদ মোশাররফ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

পাশাপাশি ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠিত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলন :

মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পাক বাহিনীর সামরিক হামলা, গণহত্যা-ধর্ষণ লুণ্ঠনের তীব্র সমালোচনা করে রাজনৈতিক সমাধানের দাবি সোচ্চার হয়। মার্কিন পাকিস্তানী চীনা বৈরীতা ও বিরোধীতা মোকাবেলায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন ও অনন্য অবদান রাখেন যদিও এই যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। এইরূপ স্বীকৃতির অর্থ দাঁড়াত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য বলে মেনে নেয়া এবং তার সমর্থনে নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি গ্রহণ করা। কিন্তু ৭১ এ সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তানে পাক শাসকচক্রের গণহত্যা, ধর্ষণ লুণ্ঠনের তীব্র সমালোচনা করলেও তাকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বলে স্বীকার করেনি। বাংলাদেশের পক্ষে তিনবার ভেটো প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দেশটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ২৪ তম কংগ্রেসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রাজেশ্বর রাও সোভিয়েত নেতা পনমারিয়েভ-এর কাছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থনের প্রশ্ন তুললে রুশ নেতা তাকে তাড়াহুড়া না করার এবং ইন্দিরা গান্ধী যাতে রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করেন সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। হেনরি কিসিংগারের জুলাই মাসে চীন সফরে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পিংপং কূটনীতির আঁতাত প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে মস্কোর পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠে রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারনে ভারতের সাথে মৈত্রী সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা। ৯ই আগস্ট স্বাক্ষরিত হয় ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি-বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তান, মার্কিন ও চীনের ত্রয়ী আঁতাতের মোকাবেলায় গড়ে উঠে এই মৈত্রী চুক্তি। সে সময় থেকে সোভিয়েত প্রচারে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারণাটি উঠে আসে যদিও আনুষ্ঠানিক ব্যবহার ছিল না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বীকৃতি পেতে প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল মুক্তিকামী শক্তির অংশগ্রহণ। এই সময়ে আওয়ামী লীগের পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে মস্কোপন্থি হিসাবে পরিচিতি ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি অংশগ্রহণ করে আদর্শিক বিবেচনায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন এই যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিআন্দোলন হিসেবে দেখতে উৎসাহী ছিল না।

একথাও সত্য ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয় ওতপ্রতভাবে। ভারতের সমর্থনে এই দলগুলোর কর্মী সমর্থকদের সামরিক প্রশিক্ষণ সীমিত আকারে দেয়া হয়। তবে চীনাপন্থী ভাসানী ন্যাপ ও একাধিক বাম দল উপদল ভারতীয় সমর্থন না পেয়ে নিজস্ব উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে সামরিক হামলার জন্যে পাকিস্তানের কঠোর সমালোচনা করে যাচ্ছিল।

পাশাপাশি বাংলাদেশের পক্ষে সোভিয়েতের সরব সমর্থন সত্বেও সচেষ্ট উদ্যোগ ছিল বাংলাদেশ প্রশ্নটি পাকিস্তান অবিভক্ত রেখে সমাধানে ভারত ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মস্কো ন্যাপের জন্য সোভিয়েতের এই অবস্থান অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠে। এই বিষয়ে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সরাসরি কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয় বুদাপেষ্ট বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তৎকালীন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধিদল পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে ন্যাপনেতা দেওয়ান মাহাবুব আলী এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডা: সারোয়ার আলী বুদাপেষ্ট সম্মেলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। সেই সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রশ্নটি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা সফল হয়নি। বাংলাদেশ দল বাংলাদেশের স্বাধীনতার

ফি রে দে খা

আমরা সবাই এ দেশের সন্তান

অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন

[২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু, উখিয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে নারকীয় হামলার ঘটনা ঘটে। তখন অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১৬ সালের এই দিনেও লেখাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই হুবহু সেই লেখাটি পত্রস্থ হলো। -সম্পাদক]

আজ থেকে একশ বছর আগে, ১৯১৪ সালে, বুদ্ধগয়ায় গিয়ে, বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবলভাবে আবেগাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বিনম্র-চিত্তে ঝুঁকে পড়ে তিনি বুদ্ধমূর্তিকে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৪৩ সালের বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি (Visva-Bharati Quarterly, April, 1943) জার্নালের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধে কৃষ্ণ কৃপালিনী উলেখ করেন:

> Only once in his life, said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was when he saw the Buddha at Gaya.

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৯৩৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "বুদ্ধদেব" শিরোনামের রচনায় উলেখ করেন:

> আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।

আজকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই দু'টি ঘটনাকে বিশেষভাবে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এই কারণে যে, যে বুদ্ধকে তিনি মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম উৎকর্ষের প্রতিরূপ বলে বিবেচনা করতেন- তাঁরই ভক্তবৃন্দের জীবনসম্পদ আজ বিপন্ন, প্রার্থনাঘর আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কবিগুরুর সেই অমরবাণী "হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান, অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান" খুব মনে পড়ছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু, উখিয়া ও আশপাশের এলাকায় যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, আমাদের স্বজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনাগৃহে ও আবাসস্থলে যে আক্রমণ হয়েছে, তা আমাদের সবাইকে বিমূঢ় করেছে, উদ্বেগাকুল ও ক্ষুব্ধ করেছে। অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এমন একটা ক্ষতি হয়েছে আমাদের প্রিয় বৌদ্ধভাইবোনদের, এমন একটা অসম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের বিশ্বাস আর যাপিত জীবনের প্রতি, আজ যেন সভ্যতার সংকট দেখা দিয়েছে। যে রাতে বুদ্ধের মন্দির আর তাঁর আদর্শের মানুষদের ঘরে আগুন দেওয়া হয়, সে রাতে কেবল বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আত্মাই পোড়েনি, পুড়েছে বাংলাদেশের আত্মাও। দেশের আত্মা থাকে দেশবাসীর হৃদয়ে, মানুষে-মানুষে সম্পর্কের বুননে। দেশ কোনও বিমূর্ত বিষয় নয়। দেশ মানে দেশবাসীর সংহতি, নাগরিক আত্মীয়তা এবং প্রতিবেশিতায় আস্থা ও বিশ্বাস। রামুর আগুনখেকোরা দেশের আত্মাকে দগ্ধ করেছে। তা করা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের নামে। তা করা হয়েছে বাঙালিত্বের নামেও। রাঙামাটি থেকে রামুতে, ২০০১ থেকে ২০১২-তে তারা কেবল হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা-গারো ও রাখাইন সমাজকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেনি, তাদের আসল নিশানায় ছিল বাংলাদেশ এবং তার বহুজন-জাতি-ধর্মের হাজার বছরের পরিচয়। প্রতিটি সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত আক্রমণে প্রথমত যা আক্রান্ত হয়েছে তা আমাদের জাতীয় সংহতি।

রাঙামাটিতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর বাঙালির নামে সন্ত্রাস এবং কক্সবাজার অঞ্চলের রামু ও উখিয়াতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ওপর চালানো সহিংসতাকে তাই সর্বজনীন দেশের ধারণাকে হুমকির মুখে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের জনপ্রিয় স্লোগানগুলোর মধ্যে ছিল, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি।' বায়ান্নোর একুশের চেতনার ধারাবাহিতায় উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের শোগান হিসেবে তা ভুল ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু অবাঙালি জনগোষ্ঠীও আছে তাই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর ওই সচেতন সাবধানতার প্রয়োজন ছিল যাতে বাঙালি জাতি-রাষ্ট্রের পরিচয় অতিক্রম করে রাষ্ট্রটি হয় বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সবার। রাষ্ট্রটি হয় গণতান্ত্রিক এবং মানবিক। দুঃখজনকভাবে তা হয়নি। নতুন রাষ্ট্রে অবাঙালিদের পরিচয়ের স্বীকৃতি না থাকায় তারাও রাষ্ট্রকে আপন ভাবতে পারল না। রাষ্ট্রও সংখ্যালঘিষ্ঠের সুরক্ষায় সচেষ্ট হল না। সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরব আধিপত্য এবং সরব সাম্প্রদায়িক-সহিংসতা বাঙালি ও মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতি ও সম্প্রদায়কে কোনঠাসাই করে রাখল। সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর এবং মহাত্মা গান্ধি থেকে শুরু করে মাওলানা ভাসানী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসাম্প্রদায়িক দেশনির্মাণের কর্মসূচি গভীরে শেকড় গাড়তে পারল না।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ একদিকে, রাষ্ট্র বা দেশের ধর্মভিত্তিক এককবাদী আত্মপরিচয় নির্মাণের ঔপনিবেশিক প্রকল্পকে প্রত্যাখান করেছিল, একই সঙ্গে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক জমিনে বহুত্ববাদের সুপ্রাচীন ধারাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই ব-দ্বীপের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ-ইতিহাসের দীর্ঘকাল ধরেই জন-জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতির বহুত্ববাদকে ধারণ করে এসেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের পরিচয়ে রাষ্ট্রে এককবাদী পরিচয়ের প্রাবল্য মূলত ঔপনিবেশিক শক্তির 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতি ও কৌশলের প্রেক্ষিত থেকে সৃষ্ট। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উৎসারিত ধর্মীয় বহুত্ববাদ উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে নজিরবিহীন এবং শাসকগোষ্ঠীর বিভেদ-সৃষ্টিকারী রাজনীতির প্রতি শোষিত সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক জবাব। স্বাধীন বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংবিধান গণমানুষের আকাঙ্খাসঞ্জাত এই বহুত্ববাদী চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা বরাবরই দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ডানপন্থী রাজনীতির আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়।

একদিকে, সামরিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মীয় এককবাদী পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চলেছে; অন্যদিকে, জন-জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতির বহুত্ববাদ বার-বার সহিংস আক্রমণের শিকার হয়েছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসকে এর আগে ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত বাউল সম্প্রদায়, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, ছায়ানট সাংস্কৃতিক আন্দোলন, হিন্দু বা কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত আক্রমণগুলো থেকে পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই। এ সব আক্রমণের মধ্যদিয়ে ধর্মীয় ডানপন্থা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভিন্নতা এবং বহুবাদীতার চিহ্নগুলো মুছে এককবাদী পরিচয় নির্মাণে সদা সচেষ্ট। ৯/১১-উত্তর বিশ্বে যুদ্ধাপরাধী জুনিয়র জর্জ বুশের 'হয় তুমি আমাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে' নীতি বা তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একক পরাশক্তিবাদী রাজনৈতিক বিষবাষ্পের আবহ তৈরি করেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বহুত্ববাদী চেতনা ও ধারা ক্রমবর্ধমানভাবে দেশি এবং বিদেশি ডানপন্থী রাজনীতির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি হয়েছে আক্রান্ত।

আমাদের তাকাতে হবে আরও গভীরে। রামু-উখিয়ায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপর আক্রমণ দৃশ্যত সাম্প্রদায়িক মনে হলেও এটা আসলে জাতীয় সংহতির ওপর রাজনৈতিক আক্রমণ। তারা এক ঢিলে সংখ্যাগুরুকে অপরাধী আর সংখ্যালঘুকে প্রতিপক্ষ করতে চেয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও সুদূরপ্রসারী। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীন, জাপান এবং আশিয়ানভুক্ত দেশসমূহকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার নীল-নকশা করা হয়েছে। মুখ্যত বৌদ্ধ-সংখ্যাগরিষ্ঠ মিয়ানমারের আরাকান থেকে মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের সূত্র ধরে এরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যেন মনে হয় বাংলাদেশ কেবল মুসলমানদের দেশ।

পৃষ্ঠা ৭

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সাংবাদিকদের সাথে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়ে উপস্থাপিত বক্তব্য

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আসন্ন শারদোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আজ পবিত্র মহালয়া, দেবীপক্ষের শুভ সূচনা। শাস্ত্রীয় নিয়মে মহালয়ার পুণ্যলগ্নে ঘোষিত হয় আনন্দময়ীর আগমন বার্তা। বাংলা ও বাঙালির শাশ্বত ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মূল সুর–ধর্মাচরণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের, কিন্তু উৎসব সব মানুষের। বাঙালি চেতনা থেকে উৎসারিত আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় শারদীয় দুর্গোৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এপুজোয় সার্বজনীনতার বাণী সেভাবেই উঠে এসেছে। আপনাদের সাথে আমাদের মেলবন্ধন সার্বজনীনতার চেতনাকে আরও সম্প্রসারিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রথমেই বলে রাখতে চাই এবার পুজো আরও বেড়েছে।

শারদীয় দুর্গোৎসব ও জন্মাষ্টমীর আগে সাংবাদিকদের সাথে আমাদের মতবিনিময় একটি নিয়মিত ধারায় পরিণত হয়েছে। আপনাদের সাথে আমরা সারাদেশে পুজোর আয়োজন, উৎসবের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করি, প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয়। আপনাদের মাধ্যমেই সারাদেশে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে যায়, আপনাদের কাছ থেকে আমরা নানা প্রস্তাবনাও পাই। এসব প্রস্তাবনা আমাদের উৎসব উদযাপনকে আরও সমৃদ্ধ করে। জন্মাষ্টমীর মতো দুর্গোৎসবও শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়, গোটা বাংলাদেশের মানুষের। যেমনটি ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, ঈদে মিলাদুন্নবী, বড়দিন ও বুদ্ধপূর্ণিমা। বাংলাদেশের মাটির ঐতিহ্য এই উৎসবগুলো পারস্পরিক বন্ধনকে আরও গভীর করেছে। তবে এবার এমন এক সময়ে আমাদের মতবিনিময় হচ্ছে, যখন সারাদেশ ধর্মান্ধতা-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা এই ধর্মান্ধতার শিকার কয়েক দশক ধরে, যার যন্ত্রণা আমরা মর্মে মর্মে বুঝি। এই প্রেক্ষাপটে আজকের এই মতবিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মাষ্টমীর মতো দুর্গোৎসবও শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়, গোটা বাংলাদেশের মানুষের। যেমনটি ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, ঈদে মিলাদুন্নবী, বড়দিন ও বুদ্ধপূর্ণিমা। বাংলাদেশের মাটির ঐতিহ্য এই উৎসবগুলো পারস্পরিক বন্ধনকে আরও গভীর করেছে। তবে এবার এমন এক সময়ে আমাদের মতবিনিময় হচ্ছে, যখন সারাদেশ ধর্মান্ধতা-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা এই ধর্মান্ধতার শিকার কয়েক দশক ধরে, যার যন্ত্রণা আমরা মর্মে মর্মে বুঝি। এই প্রেক্ষাপটে আজকের এই মতবিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুরান মতে, অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। মা দুর্গা হলেন দশভূজা। এই দশভূজা মা দুর্গার হাতেই বধ হল অসুর, জয় হল দেবকুলের। অশুভ শক্তি আজও বিরাজমান সর্বত্র। কালের বিবর্তনে আজ এর রূপ হয়েছে ভিন্ন হতে ভিন্নতর।

আজ শুধু বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বের মানুষ ধর্মান্ধতা ও সহিংসতার ভয়াবহ দানবের হাতে পীড়িত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ আজ সেই অসুরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এই অশুভ শক্তি বিনাশে আমাদেরও দেবকূলের মত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যা আমাদের শক্তি যোগাবে অসুরবধে। এ বিশ্বাসেই অকাল বোধনে প্রতিবছর বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় দশভূজা মা দুর্গার আরাধনা হয়।

আজ জগৎজননী মা দুর্গার আগমনে আনন্দ মুখরিত বিশ্ব চরাচর। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি নির্বিশেষে দেশ ও কালের সকল ব্যবধান অতিক্রম করে বাংলাদেশে উচ্চারিত হচ্ছে, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম আমাদের সবাইকে আজ এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। উৎসব এখন ধর্ম নির্বিশেষে সবার, তবে রক্তমূল্যে কেনা এই দেশটাকে 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এই চেতনায় দাঁড় করাতে আমাদের আরও সচেষ্ট হতে হবে বলে আমরা মনে করি।

এবার উৎসবের আয়োজনের কথায় আসি। গত বছর বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গা পূজা মণ্ডপ এর সংখ্যা ছিল ২৯,০৭৪। এ বছর সারাদেশে পূজা সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৯,৩৯৫। পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বছর পূজা মণ্ডপের সংখ্যা বাড়লেও পূজারীর সংখ্যা কিন্তু কমছে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ২২ শতাংশ কমে ১৯৭৪ সালে ১৪ শতাংশ এবং সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী ২০১১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮.৪ শতাংশে। এই সর্বনাশা ধস রুখতে না পারলে বাংলাদেশ শুধু তার বৈচিত্র্যই হারাবে না, হারাবে মুক্তিযুদ্ধের সকল চেতনা। জয় হবে অসুরকুলের। দশভূজা মা দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা, সকল কু চক্রি এবং অশুভ শক্তি বিনাশ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশটিকে যেন আমরা 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন, গত বছর দুর্গোৎসবের পূর্বে সারাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে পুজোয় গভীর উদ্বেগ ও শংকার ছায়া পড়েছিল। এবার সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি না থাকলেও হঠাৎ করে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা দেশের সকল পূজা মণ্ডপকে অধিকতর সতর্ক এবং সংযত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছি। আমরা কয়েকটি স্থান থেকে প্রতিমা ভাংচুরের খবর পেয়েছি। প্রশাসনের কর্মকর্তারা সাথে সাথে এলাকা পরিদর্শন করছেন, কোথাও কোথাও দুর্বৃত্তরা আটক হচ্ছে, তবে এদের দ্রুত বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করলে আমরা অধিকতর আশ্বস্ত হই। আশার কথা সম্প্রতি প্রতিমা ভাঙ্গার ঘটনায় সিলেটে এক দুর্বৃত্তর ৫ বছরের কারাদন্ড হয়েছে। এই জন্য সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তার মন্ত্রণালয়ে পুজোকে সামনে রেখে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিয়েছি। বৈঠক হয়েছে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সাথে। এছাড়াও প্রতিটি বিভাগীয় দপ্তরে এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের সাথে স্থানীয় পূজা কমিটির সভা হচ্ছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

প্রতি বছরই আমরা পুজোর আগে এই মতবিনিময় সভায় শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ব্যাপারে সর্বশেষ অগ্রগতি ও অবস্থান তুলে ধরি। এবার শুধু এক কথায় বলতে চাই আমরা, গত বছর আমরা জানিয়েছিলাম, চার দশকের বেশি সময় ধরে আমরা শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছি। জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সংশোধনীসহ গৃহীত হওয়ার পর আমাদের দাবির মুখে 'খ' তফসিল বাতিল হলেও এর অভিশাপ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। সরকারের শুভ উদ্যোগকে ব্যর্থ করতে প্রশাসনের ভেতরেই কুচক্রিরা ফণা উঁচিয়ে রয়েছে। তারাই জটিলতা সৃষ্টি করে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, হয়রানি বাড়াচ্ছে। ফলে আমাদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত হচ্ছে।

'ক' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আমলাতান্ত্রিক ধারাবাহিক প্রতিবন্ধকতা, জটিলতা ও হয়রানীর সর্বশেষ নিদর্শন হল আপিল ট্রাইব্যুনাল আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী বাদীকে সম্পত্তি ফেরত না দিয়ে জেলা প্রশাসক ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চায় বাদীকে সম্পত্তি প্রত্যর্পণে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? উত্তরে ভূমি মন্ত্রণালয় লিখছে আদালতে চূড়ান্ত রায়ে কোন রকম অসংগতি পরিলক্ষিত না হলে এবং সরকারি স্বার্থের কোন ক্ষতি সাধিত না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আদালতের চূড়ান্ত রায় সঠিক হয়েছে কি না তার বিচারের ভার জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত করছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এই হল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের সর্বশেষ অবস্থা।

আপনাদের সাথে মতবিনিময় করার সূচনা থেকে বলে আসছি, যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মিলনায়তনে বসে আমরা জাতির বিবেক সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছি, সে মন্দিরের দুই তৃতীয়াংশ দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখল হয়ে গেছে। ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক মন্দিরে ঢোকার পথটি এতো সংকীর্ণ যে, দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অতিথিরা পরিদর্শনে এলে এক বিব্রতকর অবস্থার মুখে পড়তে হয়। তাছাড়া নিরাপত্তা ঝুঁকিও রয়েছে। রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমের ২ দশমিক ২২ একর দেবোত্তর ভূমি আমরা এখনো ফিরে পাইনি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মপরিধি সম্প্রসারিত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুরূপ হিন্দু ফাউন্ডেশন গঠনের দাবি পূরণ হয়নি। দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়নের দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু যে দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন এবং মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছিল, তা ছিল আমাদের স্বার্থের পুরোপুরি পরিপন্থি। আমাদের দাবির মুখে আইনি প্রস্তাবটি স্থগিত হয়ে হলেও আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন এখনও প্রণয়ন করা হয়নি।

দুর্গোৎসবের ছুটি বাড়ানোর দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের, কিন্তু ছুটি বাড়েনি।

আমরা দুর্গোৎসব ও জন্মাষ্টমী রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় উৎসবের আঙ্গিকে উদযাপন এবং বঙ্গভবনসহ সকল প্রধান প্রধান সরকারি ভবনে আলোকসজ্জা, রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক জাতীয় পতাকা ও শুভেচ্ছাবাণী দিয়ে সুসজ্জিত করা, কারাগার হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রমে পুজোর কয়েকদিন সরকারিভাবে উন্নত খাবার পরিবেশনের দাবি জানিয়েছি।

আমরা রাজধানীসহ সারাদেশে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি জানিয়ে আসছি। কারণ এর সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমরা এক নতুন সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছি। পুজো মন্ডপে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে আমাদের বাণিজ্যিক হারে চার্জ করা হচ্ছে। এটা অস্বাভাবিক, অনেক মন্ডপের পক্ষেই এই হারে বিদ্যুৎ ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদের মাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মনে করে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসৃত হলে সকল অসঙ্গতি ও বৈষম্য দূর হয়ে যাবে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। সবার অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে যেতে পারবে। দুর্গোৎসবের চেতনায় অসুর বধ করে সুর প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে দেশবাসী, আজকের দিনে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

এবার আপনারা জানেন বিজয়া দশমীর পরদিনই আশুরা উদযাপিত হবে। আমরা যথানিয়মে ১১ অক্টোবর বিজয়া শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সন্ধ্যার আগে বিজয়া শোভাযাত্রা শেষ করার জন্য বলা হয়েছে এবং রাত ৯টার মধ্যে বিসর্জন সম্পন্ন করতে হবে। আমরা দুই উৎসবের পবিত্রতা রক্ষায় আমাদের সকল অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছি। আপনাদের অবগতির জন্যে জানাতে চাই, ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার আসন্ন আশুরা নিয়ে আইজি মহোদয় আয়োজিত এক সভায় আমাদের সভাপতি মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সে সভায় আইজিপি মহোদয় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের তৎপরতা বিশেষ করে পুজোয় শৃংখলা রক্ষার বিষয়টি তুলে ধরে পরিষদের প্রশংসা করেন। তিনি আরও উলেখ করেন, অনেক সময় ঈদ ও পুজোর বিসর্জন কিংবা পুজো ও আশুরা একদিনে বা পরপর পড়ার পরও যেভাবে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নিয়ম-শৃংখলা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে তা অত্যন্ত বিরল। তাদের নির্দেশ সারাদেশের পুজোমন্ডপগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি কোথাও।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সকল জেলা পূজা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ঐতিহাসিক মঠ মন্দিরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের বর্ধিত সভায় যে দাবিসমূহ উঠে আসে সেগুলোই আপনাদের মাধ্যমে সরকার ও দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছি :

(১) শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনদিনের ছুটি ঘোষণা করতে হবে। (২) শারদীয় দুর্গোৎসবে ঈদের মতো বঙ্গভবন, গণভবন, নগরভবন এবং জেলা পর্যায়ে সরকারি ভবনসমূহে আলোকসজ্জা করতে হবে। (৩) দেশের সকল কারাগারে পুজোর দিনগুলোতে উন্নত খাবার পরিবেশন করতে হবে। (৪) ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাতিল করে হিন্দু ফাউন্ডেশন গঠন করতে হবে। এবং (৫) পুজো মণ্ডপে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের বর্ধিত সভায় যে দাবিসমূহ উঠে আসে সেগুলোই আপনাদের মাধ্যমে সরকার ও দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছি :
(১) শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনদিনের ছুটি ঘোষণা করতে হবে। (২) শারদীয় দুর্গোৎসবে ঈদের মতো বঙ্গভবন, গণভবন, নগরভবন এবং জেলা পর্যায়ে সরকারি ভবনসমূহে আলোকসজ্জা করতে হবে। (৩) দেশের সকল কারাগারে পুজোর দিনগুলোতে উন্নত খাবার পরিবেশন করতে হবে। (৪) ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাতিল করে হিন্দু ফাউন্ডেশন গঠন করতে হবে। এবং (৫) পুজো মণ্ডপে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই, যাতে আমাদের এই বক্তব্য সারাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আপনারাও যদি কিছু প্রস্তাবনা রাখেন শারদোৎসবকে আরো আনন্দময় ও সার্বজনীন করতে, আমরা সানন্দে তা গ্রহণ করবো। বক্তব্য বাড়িয়ে আপনাদের আর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। তবে শেষ করার আগে একটা অনুরোধ আপনাদের সামনে রাখতে চাই, টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যমে আপনারা যদি আরও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার এবং বিশেষ নিবন্ধ ও খবর প্রচারের ব্যবস্থা নেন, শারদীয় দুর্গোৎসব সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ হবে। এটা জাতীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

শারদোৎসব বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহকোণ আনন্দে ভরিয়ে তুলুক। আপনাদের সবাইকে উৎসবে সপরিবারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে।

বাংলাদেশের শাশ্বত রূপ এটাই

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

অনেক রাজনীতিককে দেখলো, বঙ্গবন্ধু বলতে অজ্ঞান। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর ধারাকে নিশ্চিহ্ন করতে তারাই সামনে থাকলো।

আর এই পরিবর্তনের মূল ভিত্তি হলো ধর্ম। যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধ করেছিলেন সাংবিধানিকভাবে, তা ছাঁটাই করা হলো সংবিধান থেকে। ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষ রাজনীতির মূল ধারায় পরিণত হলো। রাজনীতিকরা ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে এবং ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে এই রাজনীতির সাথে আপস করলেন। তরুণরা এটা দেখলো। আজ তারুণ্যের একাংশের অধোগতি দেখে অনেকে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু জবাবটা দিতে হবে রাজনীতিকদের, বুদ্ধিজীবীদের। আজ জঙ্গিবাদ ডালপালা মেলে মানচিত্রকে খামচে ধরেছে, দেশকে পাকিস্তানি পতাকায় ফিরিয়ে নিতে চাইছে। কেন প্রশ্ন উঠছে না, যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, কিংবা হত্যায় সহযোগিতা করেছে পাকি বাহিনীকে, তাদের যখন বিচার হয় কারা সে বিচারের বিরুদ্ধাচরণ করে? কারা ঘাতকদের হাতে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার পতাকা তুলে দিয়েছিল? কেন ডাক আসে না, আসুন আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করি, স্বাধীনতার মূল চেতনাকে সর্বস্তরে নিয়ে যাই। কেন ডাক দেয়া হচ্ছে না, আসুন দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে আমরা যাদের সঙ্গে পাবো না, তাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করি। এই সাহস আসতে হবে।

জঙ্গিবাদ সব ধর্মের মানুষের জন্যেই হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতোদিন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়েছে। হামলা, নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে দেশ ছেড়েছে, জায়গা-জমি হারিয়েছে। তাদের সংখ্যা দিনদিন কমে এসেছে। এ নিয়ে রাজনীতিকদের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি। কিন্তু আজ যখন মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর, বিদেশিদের ওপর এই হামলা সম্প্রসারিত হয়েছে তখন হৈচৈ হচ্ছে। শূন্য টলারেন্সে জঙ্গিবাদ বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে, কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। যেদিন সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের মূল নীতি হারালো সেদিন প্রতিবাদ উঠেছে ক্ষীণ কণ্ঠে। যদি সেদিন পথে নামতেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তি, আমি বিশ্বাস করি, আজ দেশ এভাবে জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হতো না। বিপর্যয়ের মুখে পড়তো না। যেদিন মন্দিরে পাহাড়ায় পুজোর আয়োজন হচ্ছিল, আমরা বলেছিলাম, এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর পাহাড়ায় পুজো করতে হবে না। বড়দিন উদযাপিত হবে না পুলিশ পাহাড়ায়, বুদ্ধপূর্ণিমা উদযাপন হবে না কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে। উৎসব সবার, ধর্ম পালন করবেন ওই সম্প্রদায়ের মানুষ মনের আনন্দে। আর উৎসবে মেতে উঠবে গোটা দেশ। আজ সেই ধর্মান্ধতার সঙ্গে আপসের ফল দাঁড়িয়েছে, কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে নামাজের আয়োজন করতে হচ্ছে। এই বাংলাদেশ তো আমরা চাইনে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ চেয়েছি, যেখানে বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। এটাই ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা যখন বিকৃতভাবে করা হতে থাকলো, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকরাও শক্তভাবে দাঁড়ালেন না। এড়িয়ে গেলেন। পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে অনেকে সাহস করে কিছু বলতে চাননি, তাও দেখেছি। রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধেও শক্ত অবস্থান দেখিনি। আজ আমরা দেখছি, রাষ্ট্রধর্ম এখনো জ্বলজ্বল করছে অনেক পরিবর্তনের পরও। আমাদের মধ্যে সত্যি সত্যি দ্বিচারিতা আছে। 'সত্যেরে লও সহজে' এই কথাটাও সহজভাবে উচ্চারণ করতে পারছি না। বাহাত্তরের সংবিধানে পুরোপুরি ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন আজ কেউ কেউ। আমরা আশায় রইলাম। সেদিন ফিরে আসুক।

শ্রীমঙ্গল ও হবিগঞ্জ সারাদেশকে পথ দেখিয়েছে। আমরা জানি, মেঘ কেটে যাচ্ছে। জঙ্গিবাদী হানা আমাদের চোখ যদি খুলে দিতে পারে, তবেই আগামি দিন আমাদের জন্যে মঙ্গল বয়ে আনবে। আমরা যদি সবাই এক হয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি, তবেই দেশ বাঁচবে। ইতিহাসবিদ মুনতাসির মামুন বলেন, আমাদের অনেকের হৃদয়ে হেফাজত বাস করে। আমরা এই বাস্তবতা অনেক আগেই দেখেছি।

১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রধর্মের প্রেক্ষাপটে যখন অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জন্ম নিল তখন কেউ কেউ এই সংগঠনকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করেছিলেন। একেবারে সেই উষালগ্নে দুটি মানুষকে দেখেছি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে, এই সংগঠন আমাদের দেশের অনেক দলের চাইতে অসাম্প্রদায়িক। কারণ তারা পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। লড়াই করছে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। এই দুই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হচ্ছেন বিচারপতি কে এম সোবহান ও সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ। আজ তারা প্রয়াত, কিন্তু বলতে ইচ্ছে করছে, আপনারা আজ দেখে যান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শ্রীমঙ্গল এবং হবিগঞ্জ যে পথ দেখিয়েছে তা আজ সবাইকে পথ দেখাক। এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যেই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কাজ করছে। এই সংগ্রাম সবাইকে মিলিত সংগ্রাম হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের ইতিহাসে এভাবেই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশে প্রতিটি ঘর হবে প্রতিরোধের দুর্গ, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

আজ রাজনীতিকদের কাছে আমাদের আহ্বান, আপনারা দেশ বাঁচান। দেশ বাঁচলে সবাই বাঁচবে। ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নির্মূল করতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মীরা এক কাতারে দাঁড়ালে কারো সাধ্যি নেই এদেশে জঙ্গিবাদ এগিয়ে নিয়ে যায়। দেশ আজ এক ক্রান্তিকালে, আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির মধ্যে বিভেদ বৈষম্য পরাজিত শক্তিকে সুযোগ করে দেবে, জঙ্গিবাদকে শক্তিশালী করবে। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য যাই থাকুক, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির মধ্যে কোনো বিভাজন আমরা চাই না। বিভাজন জঙ্গিবাদ ও ধর্মান্ধতার অবস্থান শক্তিশালী করবে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে আর যেন ধর্মান্ধতার রাজনীতি মাথা তুলতে না পারে। একাত্তরের পরে অনেক ভুল হয়েছে, আর কোনো ভুল আমরা এদেশে চাই না। আমরা আজ ঐক্যবদ্ধ, এই ঐক্য যেন শাশ্বত রূপ পায়।

৪শ' বছরের পুরোনো একটি রহস্যময় তেঁতুল গাছ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

(তেঁতুল) খেলে যে কোন রোগ কমে যায়। ঠাকুর বানী মন্দিরের বর্তমান ঠাকুর গৌপদ গোস্বামী বলেন, ঠাকুর বানীর তেঁতুল গাছ দেখার জন্য প্রতিদিন লোকজন আসেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে হিন্দুরা আসেন ঠাকুর বানী গাছের তেঁতুল খেতে। বাংলাদেশের মুসলমানরা ঠাকুর বানীর কেরামতিকে বিশ্বাস করে গাছের তেঁতুল খেয়ে থাকেন।

গ্রামের বয়স্ক বৃদ্ধ ছায়েব আলী জানান, আমরা ছোটবেলা থেকেই গাছটি এমন দেখে আসছি।

তিনি আরো জানান, আমার দাদা ও মুরব্বিদের মুখে শুনেছি তাদের জন্মের অনেক আগে গাছটির জন্ম। তিনি জানান, এ গাছটির বয়স আমি নিজেও জানি না।

কথিত আছে এই গাছ কাটার নিয়তে কেউ গাছের কাছে গেলে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত এসে মারা যায়। গাছটি এর আগে বেশ কয়েকবার বিক্রি করা হয়। কিন্তু কেউ কাটতে সাহস পায়নি। বর্তমানে গাছটির গোড়ায় অনেকে মানত করে রান্না করা খাবার খেয়ে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি আগরবাতি ও ধূপ জ্বালায়। তাই এ গাছটির রহস্য নিয়ে নবীগঞ্জ উপজেলাসহ আশপাশের উপজেলার মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে।

বর্ধিত সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৮ অক্টোবর ২০১৬ ইং তারিখ শুক্রবার সকাল ১০টায় পুরানা পল্টনস্থ কমরেড মনি সিংহ- ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্ট ভবনের ৫ম তলায় শহীদ তাজুল মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সকল সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ, অংগসংগঠন বাংলাদেশ আইনজীবী ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ,বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সংগঠনের জেলা কমিটিসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এতে উপস্থিত থাকবেন। উক্ত সভায় আপনাকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আলোচ্যসূচি :

১. শোক প্রস্তাব পেশ
২. বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
৩. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ
৪. গঠনতন্ত্র সংশোধন সাব-কমিটি কর্তৃক গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংশোধনী পেশ
৫. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর আলোচনা
৬. সাংগঠনিক ও প্রস্তাবিত সংশোধনী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৭. বিবিধ

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সংগ্রামী শুভেচ্ছান্তে-

(এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ

আমরা সবাই এ দেশের সন্তান

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু উভয়েরই এরা দুশমন। এমন সর্বনাশা ভুলের কারণেই পাকিস্তান আজ ধ্বংসের কিনারে। রামু-বিপর্যয়ে অন্ধকারের শক্তি যে ধ্বংসের বার্তা বহন করে এনেছে, তার মধ্যে আগামিদিনের বাংলাদেশের সমূহ বিপদ সবাইকে বুঝতে হবে। অন্যদিকে তাকাতে হবে কোনঠাসা, আগ্রাসনে চাপা-পড়া জনগোষ্ঠীর আহত আত্মার গভীরেও।

রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে আজ আমাদের ভাবতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল শুধু স্বাধীন দেশ নয়, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও। পরিতাপের কথা, গত চারদশকে রাষ্ট্র তার গণতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করতে পারেনি। তাই আক্রান্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রতিরক্ষায় স্বতস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্র-প্রশাসন এগিয়ে আসেনি। ভাবতে হবে আমাদের বর্তমান সংবিধান নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম ৭২-এর সংবিধান যার অন্যতম ভিত্তি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা।

উপর্যপুরি সেনা-স্বৈর-মৌলবাদী শাসনে সে সংবিধানের সর্বজনিন চরিত্রকে মলিন করা হয়েছে। সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে যুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে পরিহাস করা হয়েছে। কার্যত তাকে পরিণত করা হয়েছে একটি বিশেষ ধর্মের সংবিধানে। আরও ভাবতে হবে সংখ্যাগুরু-মনস্তত্ত্বে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের উপস্থিতির কথা। তেমনই বিশ্বায়িত দুনিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির অভাবিত উন্নতির কারণে গুগল-ফেসবুক-ইউটিউব-এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনও স্থানের ঘটনা যত দ্রুত ও ব্যাপকতার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষকেও প্রভাবিত করে এবং নতুন সব ঝুঁকির মুখে আমাদের ঠেলে দেয় তার ভয়াবহতা নিয়েও। পাশ্চাত্যে ক্রমাগত ইসলামবিদ্বেষ ও মুসলিম দেশগুলোতে আগ্রাসনে আতঙ্কিত মুসলিম চেতনা স্পর্শকাতর হয়ে আছে। সংখ্যাগুরুর এই তটস্থ মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার অপশক্তিরও অভাব নেই। অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতা-বোধে জর্জরিত অবাঙালি ও অমুসলিম জনগণও ভীত ও আহত। প্রতিটি সম্প্রদায় ও পরিচয়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে চালনা করার এই পরিস্থিতি বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রের জন্য গুরুতর নিরাপত্তা-উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সমুদ্রসীমা, খনিজ সম্পদ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা মিলিয়ে এই পরিস্থিতিকে মোটেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

রামুর পোড়া বুদ্ধমূর্তিগুলো ও বৌদ্ধ ভাইবোনদের অশ্রুতে আমরা কোন সত্য প্রত্যক্ষ করব? এভাবেই কি জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় আর ধর্মের মধ্যকার বৈচিত্র্য আমরা ফাটলে পরিণত হতে দেব? দেশ, সমাজ, সম্প্রদায় ভাগের শেষে এমনকী পরিবার-ভাগের শেষে আমরা কি আমাদের মনটাকেও ভাগ করতে বসব? এভাবে ভাঙতে-ভাঙতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা? একটাই দেশ আমাদের, একটাই রাষ্ট্র আমাদের, একে আমরা আর ভাগ হতে দিতে পারি না। এখনই প্রয়োজন বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান আর বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘুরা এক হয়ে স্বদেশকে আপন করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার। সেটাই একাত্তরের পথ। পথ-হারানো বাংলাদেশকে তাই আবার একাত্তরের অভিজ্ঞতা ও ঐক্যের কাছেই ফিরতে হবে। সে ঐক্যের লক্ষ্য হবে সাংবিধানিকভাবে স্বদেশকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে দেশবাসীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। সে বাংলাদেশে জাতিগত সংখ্যালঘু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান সবাই হবে এ দেশের সন্তান এই বলে আমরা গর্ব করতে পারি।

আমার এ বক্তব্যের শেষে আমি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'নবযুগ' প্রবন্ধ থেকে ক'টি বাক্য উদ্ধৃত করতে চাই।

নজরুল আমাদের সবাইকে উদাত্ত চিত্তে আহবান করে বলেন:

এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ!
এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া,
সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ, পরিহার করিয়া
প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।

আসুন নজরুলের অমরবাণী

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান

আমরা স্মরণ করি এবং হৃদয় দিয়ে আত্মস্থ করি।

লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

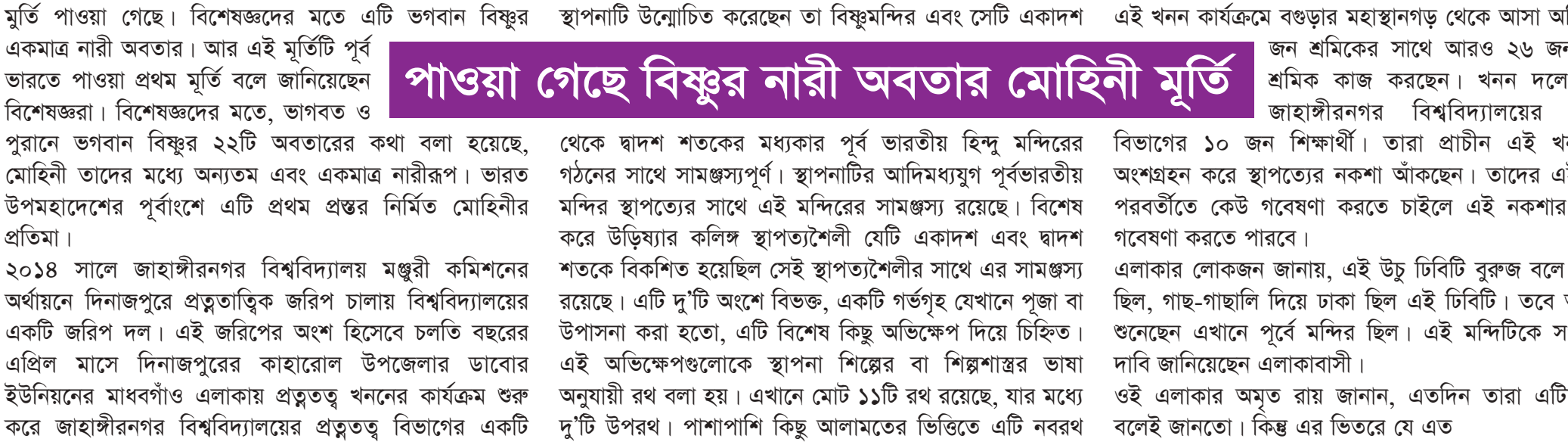

দিনাজপুরে দ্বাদশ শতকের বিষ্ণু মন্দির আবিষ্কার

॥ রতন সিং, দিনাজপুর থেকে ॥

পাওয়া গেছে বিষ্ণুর নারী অবতার মোহিনী মূর্তি

দিনাজপুরে প্রত্নতত্ত্ব খননে একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের সময়কালের একটি বিষ্ণু মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই মন্দিরটি নবরথ বিশিষ্ট, যা বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মন্দিরের মধ্যে এই প্রথম। শুধু তাই নয় এই প্রত্নতত্ত্ব খননে দুস্প্রাপ্য মোহিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি ভগবান বিষ্ণুর একমাত্র নারী অবতার। আর এই মূর্তিটি পূর্ব ভারতে পাওয়া প্রথম মূর্তি বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাগবত ও পুরানে ভগবান বিষ্ণুর ২২টি অবতারের কথা বলা হয়েছে, মোহিনী তাদের মধ্যে অন্যতম এবং একমাত্র নারীরূপ। ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশে এটি প্রথম প্রস্তর নির্মিত মোহিনীর প্রতিমা।

২০১৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থায়নে দিনাজপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জরিপ দল। এই জরিপের অংশ হিসেবে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ডাবোর ইউনিয়নের মাধবগাঁও এলাকায় প্রত্নতত্ত্ব খননের কার্যক্রম শুরু করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি দল। মাত্র দুই সপ্তাহের খননেই এখানে পুরাতন স্থাপত্যশৈলীর মন্দিরটি রয়েছে বলে নিশ্চিত হয় দলটি। এরপর বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থায়নে টানা ৩ মাসের অধিক সময়ে ধরে খনন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দলটির সদস্যরা এখানে যে স্থাপনাটি উন্মোচিত করেছেন তা বিষ্ণুমন্দির এবং সেটি একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যকার পূর্ব ভারতীয় হিন্দু মন্দিরের গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্থাপনাটির আদিমধ্যযুগ পূর্বভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের সাথে এই মন্দিরের সামঞ্জস্য রয়েছে। বিশেষ করে উড়িষ্যার কলিঙ্গ স্থাপত্যশৈলী যেটি একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে বিকশিত হয়েছিল সেই স্থাপত্যশৈলীর সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে। এটি দু'টি অংশে বিভক্ত, একটি গর্ভগৃহ যেখানে পূজা বা উপাসনা করা হতো, এটি বিশেষ কিছু অভিক্ষেপ দিয়ে চিহ্নিত। এই অভিক্ষেপগুলোকে স্থাপনা শিল্পের বা শিল্পশাস্ত্রর ভাষা অনুযায়ী রথ বলা হয়। এখানে মোট ১১টি রথ রয়েছে, যার মধ্যে দু'টি উপরথ। পাশাপাশি কিছু আলামতের ভিত্তিতে এটি নবরথ বিশিষ্ট একটি মন্দির বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। খননকালে এখানে প্রস্তর প্রতিমার ভগ্নাংশ হিসেবে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর সমপদাস্থানক ভঙ্গিতে দন্ডায়মান প্রতিমার হাতে থাকা শঙ্খ, চক্র, গদা, বিষ্ণুপ্রতিমার বনমালা শোভিত পায়ের ভগ্নাংশ এবং একটি দেবী প্রতিমার ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে।

এই খনন কার্যক্রমে বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে আসা অভিজ্ঞ ১৩ জন শ্রমিকের সাথে আরও ২৬ জন স্থানীয় শ্রমিক কাজ করছেন। খনন দলে রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থী। তারা প্রাচীন এই খননকাজে অংশগ্রহন করে স্থাপত্যের নকশা আঁকছেন। তাদের এই নকশা পরবর্তীতে কেউ গবেষণা করতে চাইলে এই নকশার মাধ্যমে গবেষণা করতে পারবে।

এলাকার লোকজন জানায়, এই উচু ঢিবিটি বুরুজ বলে পরিচিত ছিল, গাছ-গাছালি দিয়ে ঢাকা ছিল এই ঢিবিটি। তবে অনেকেই শুনেছেন এখানে পূর্বে মন্দির ছিল। এই মন্দিরটিকে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ওই এলাকার অমৃত রায় জানান, এতদিন তারা এটিকে ঢিবি বলেই জানতো। কিন্তু এর ভিতরে যে এত

পৃষ্ঠা ৩

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ৪শ' বছরের পুরোনো একটি রহস্যময় তেঁতুল গাছ

উত্তম কুমার পাল হিমেল, নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) থেকে : নবীগঞ্জ উপজেলার ৪শ' বছরের পুরোনো একটি রহস্যময় তেঁতুলগাছ নিয়ে সর্বত্র আলোচনার ঝড় বইছে। এ তেঁতুল গাছের কাহিনী যেন রূপকথার গল্প। ঠাকুরের হাতের রোপণ করা গাছের তেঁতুল জটিল রোগের মুক্তি মেলে নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করেন।

প্রতিদিন ঐ গাছের নিচে শত শত দর্শনার্থীরা আসেন পূজা দিতে এবং মুসলমান নর-নারী আসেন নিজের মনোবাসনা পুরাণের জন্য নিয়াজ অথবা শিরনী নিয়ে। বিশাল এ গাছের নিচে রয়েছে শিববানী ঠাকুরের ১টি মন্দির ১টি নাট মন্দির ও যাত্রী নিবাস বসতঘর রয়েছে। নবীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার অদূরে গজনাইপুর ইউনিয়নের শতক গ্রামের শিববানী ঠাকুরের বাড়িতে চারশত বছরের পুরনো একটি তেঁতুল গাছ। এই গাছটি দেখতে অনেকে যান ঠাকুর বাণীর বাড়িতে। আবার মানতও করে থাকেন অনেকে।

এই গাছটি নিয়ে এলাকায় নানা প্রবাদ রয়েছে। প্রায় ১০ কাঠা জমির ওপর ছড়িয়ে আছে এ বিশাল পুরনো তেঁতুল গাছটি। গাছের এক একটি শিকড় প্রায় ৩০-৪০ ফুট দীর্ঘ হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৪০/৫০ ফুট ডাল পালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

প্রায় ৫ বছর আগে এই গাছের শিকড় ২ কিলোমিটার দূরে দেখতে পাওয়া গেছে।

শিববানী ঠাকুরের উত্তরসূরী দিনাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌরপদ গোস্বামী তেঁতুল গাছ সম্পর্কে বলেন, শুনছি অন্তত ৪শ বছর আগে ঠাকুর বানী (শিববানী ঠাকুর) নামে এক ঠাকুর তার মা এর জন্য বাজার থেকে টক তেঁতুল নিয়ে আসলে ঐ খেয়ে শেষ হয়ে গেলে সকালে মা আবারো তেঁতুল খেতে চাইলে ঠাকুর বানী মাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি তেঁতুল খেয়ে এর বীজ কোথায় রেখেছেন? মা তাকে বলেন, ঘরের পার্শ্বে রেখেছি ঐ কথা শুনে তিনি তেঁতুল বীজের কাছে গিয়ে হাতের লোটা থেকে একটু পানি ছিটিয়ে দিলে সাথে সাথে বীজ থেকে গাছ জন্ম নেয় এরপর গাছে ফুল ফুটে তেঁতুল গাছে উঠে উধাও হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুজি করে ঠাকুর বানীকে পাওয়া যায়নি। এরপর থেকে ঠাকুর বানীর তেঁতুল গাছটিকে ঘিরে রহস্য বিরাজ করছে। হিন্দু মুসলিম সবাই বিশ্বাস করেন ঠাকুর বানী জীবিত আছে। বিভিন্ন পূজায় তিনি ঐ গাছে আসেন তাই দর্শনার্থীদের ভীড় জমে প্রতিটি পূজায়।

এলাকাবাসী জানান, তেঁতুল গাছের তেঁতুল টক হবার কথা থাকলেও তা টক নয় অত্যন্ত সুস্বাদু মজাদার। একবার খেলে বার বার খেতে ইচ্ছা হয়। অনেকের তেঁতুল খেয়ে মনোবাসনা পূরণ হয়েছে। প্রতি বছর ঐ গাছে ১৫/২০ মণ তেঁতুল আসে। তা ভক্তবৃন্দের মাঝে বিতরণ করা হয়। তেঁতুল গাছের আকার প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে এখন বিশাল আকার ধারণ করেছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতে প্রতি সরস্বতী ও দুর্গা পূজায় শিব ঠাকুর বানী তেঁতুল গাছে আসেন। ঐ দুটি পূজায় হিন্দুরা সারারাত জেগে কীর্তন করেন। শতক গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিতোষ চক্রবর্তী বলেন, আমাদের গ্রামের ৪শ' বছরের পুরোনো রহস্যময় তেঁতুল গাছটি সম্পর্কে শুনছি। একদিনের গাছ রোপণ করে তার মাকে তেঁতুল খাওয়ার জন্য দিয়েছিলেন।

এটা কোন রূপকথা নয় সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। একই এলাকার নরপতি শীল (৮০) বলেন ঠাকুর বাবার হাতের লাগানো (ঠাকুর বানী) গাছের ফল

পৃষ্ঠা ৭

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার পাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২